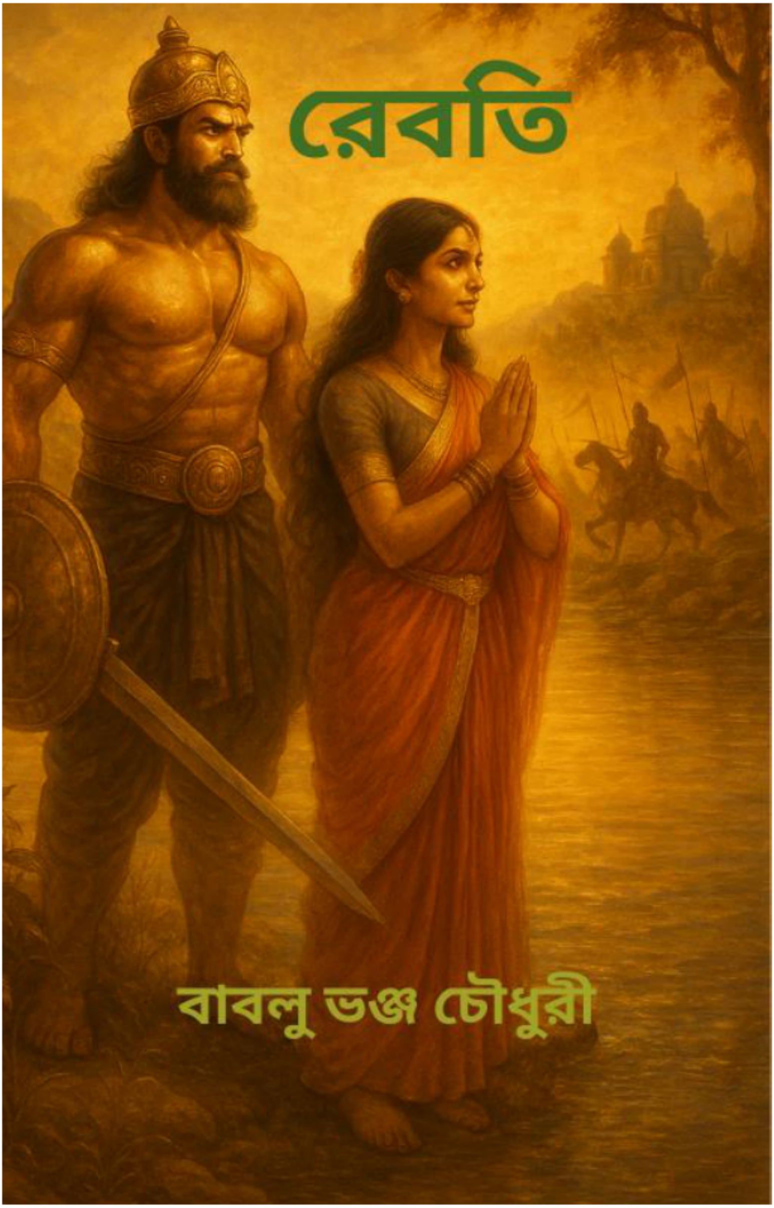

রেবতি
বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী

রেবতি

বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী

রচনাকাল

নভেম্বর, ২০২১

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

চ্যাটজিপিটি

অলংকরণ

ক্যানভা

"History will be kind to me for I intend to write it."

- Winston Churchill

উৎসর্গ :

ঝিনুক,কাব্য,আরুষ-কে

এ গল্পকে ইতিহাস আশ্রয়ী বলা যায় না। কারণ, এর মধ্যে ইতিহাস নেই। বরং একটা পরিচিত প্রাচীন সময়ের পটভূমিতে গল্পটি লেখা, যেখানে রাজা রয়েছেন, রয়েছেন সেনাপতি। মূলত তিনটি তথ্যকে জাগিয়ে রাখার জন্য এই গল্পটি লিখতে তাগিদ পেয়েছি, তথ্যগুলো ঐতিহাসিকদের দেওয়া। তা হল- মানসিংয়ের পুত্র জগতসিংয়ের বিয়ে হয়েছিল বর্তমান বাংলাদেশের কালীগঞ্জ উপজেলার মৌতলাতে, দুই-যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের যে হাবসিখানা এখনও অবশিষ্ট রয়েছে, সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে অতিথিশালা, সেখানে কতলূ খাঁ'র পুত্র জামাল খাঁ'র মতো ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে থাকতেন, আর তিন. বিজয়রাম ভঞ্জ নামে প্রতাপাদিত্যের একজন সেনাপতি ছিলেন।

- বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী

নভেম্বর, ২০২১; দক্ষিণশ্রীপুর

রেবতি

বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী



কুশলীক্ষেত্রে সন্ধ্যা নেমেছে। শূন্য ক্ষেত্রের চারদিকে বৃক্ষ-চক্রের আঁধার পাতলা করে ধীরে উঠছে চাঁদ। সারাদিনের তাপদাহের পর সন্ধ্যার বাতাসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে বৃক্ষরাজি। নির্জন নিরিবিলি ক্ষেত্রের সীমানায় জলপাইয়ের গাঢ় ছায়ায় শ্বেত ইরানি ঘোড়ার পিঠে বসে একাকী যুদ্ধ ছক কষছে বিজয়রাম ভঞ্জ। ঠিক সেই সময় বাতাসে রেশমি নরম ছোঁয়ার মতো ভেসে এল ঘোড়ার

নাসিকা টানার শব্দ। একুশ বছরের যুবক বিজয়রাম বিস্মিত ও চমকিত হল। সে ছাড়া আর কারও এখানে থাকার কথা নয়। আজ সকালের খবর-মানসিংহের সেনারা শালিখা পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে, প্রতিহতকারীদের চোখ এড়িয়ে ইছামতি আর যমুনা নদী পার হয়ে এর মধ্যেই এত ভিতরে তাদের পৌঁছে যাওয়া অসম্ভব। শব্দের উৎস্য অনুসন্ধানে তাই বিজয়রাম ঘোড়ার পিঠ থেকে সন্তর্পণে নেমে পাশের বন-সদৃশ বাগানে ঢুকল। এলো কেশের মতো আঁধার বিছায়েছে বিস্তৃর্ণ বনতলে। উর্দ্ধতলে গাছের শাখা-প্রশাখা উদীয়মান চাঁদের রুপোলি মায়ায় উদ্ভাসিত। ঘোড়ার সেই ঘরঘর ডাকটি প্রগাঢ় থেকে প্রগাঢ়, শান্ত ঘুমের মতো শান্ত করে দিচ্ছে বিজয়রামের সমস্ত অন্তকরণ। আনারসবনের বিছানার ওপর ঝাঁকড়া জলপাইগাছের গোড়ার ফাঁকা জায়গায় জোছনা আর আঁধার কাঁপিয়ে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল বিজয়রামের। একটা হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে। কার ঘোড়া ওটা? উন্মুখ বিজয়রাম এগিয়ে চলে সেদিকে। স্নিগ্ধ বনতলের গন্ধের সঙ্গে ঘোড়ার গন্ধটিও ভেসে আসে। বেশ পরিচিত। বিজয়রাম ভাবতে ভাবতে একতাল কাঁঠালবাগানের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে। তখনই পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে বিজয়ের পথের ওপর দাঁড়ায় একটি যুবতী। তার স্থির দেহ রেখার পাশ দিয়ে আলোর ফোয়ারা ছড়াচ্ছে পশ্চাতের চাঁদ । বিজয়রামের চিনতে ভুল হল না। তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মৃদুভাবে বলতে লাগল, ‘ঘোড়ার গন্ধ পেয়েই বুঝেছিলাম, কিন্তু যুদ্ধের এই প্রান্তরে এভাবে একাকী আসার কী মানে রেবতি?’

এক লহমায় মুখের আভরণ খুলে ফেলল যুবতী, ‘আমি কি যুদ্ধে পারঙ্গম নই?’

‘সে কথা বলিনি, কিন্তু এই যুদ্ধে তুমি নির্দেশিত নও, তাহলে খাঁজা কামাল আমাকে বলতেন।’

‘না,...আমি যুদ্ধে আসিনি বিজয়,’ যুবতী দেহ কুঞ্চিত করে দুই হাত ভিক্ষামাগার মতো সামনে বাড়িয়ে ধরল। মৃদু ও সকরুণভাবে বলল, ‘শুধু শেষ বারের মতো একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি, হাত দুটো দাও একটি বার, ’ কথার সঙ্গে ভেতরের আক্রান্তের খবর উঠে আসে।

‘কিন্তু...’

‘জানি, তুমি যুদ্ধ নিয়ে চিন্তিত, খবর রাখো না বলে ভাবনা বেশি তোমার...’

বিজয়রাম ভুরু কুঞ্চিত করে খবরের আশায় যুবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে পড়ে।

‘এ যুদ্ধ হচ্ছে না বিজয়, মানসিংহের সাথে যশোহররাজের সন্ধি হয়েছে, বরং সৈন্য সামন্ত নিয়ে এক আনন্দ অনুষ্ঠান হবে, যশোহররাজ সেখানে নিমন্ত্রিত।’

‘কিন্তু খাঁজা কামাল তো কিছু বললেন না!’

‘হয়ত সময় পাননি, আজ দুপুরের খবর, ’ যুবতী থমকে গিয়ে আঙুলে আঙুল খুঁটতে লাগল, ‘আগামী শনিবার যশোরেশ্বরী

মন্দিরে পূজাপার্বনের পর মানসিংহের ছেলের বিয়ে হবে মৌতলায়, আর…' যুবতীর বাক্ রুদ্ধ হয়ে এল।

'মৌতলায়!' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল বিজয়।

'হ্যাঁ, খাঁজা কামাল যশোহররাজের পরামর্শে সব ব্যবস্থা পাকা করেছেন।'

বিজয় দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল, 'তোমার কথা যদি সত্য হয়, তবে আমি এখনই এ স্থান ত্যাগ করব, আর যদি মিথ্যে হয়…'

যুবতি চমকে উঠল, 'তোমার কি মনে হয় আমি মিথ্যে বলছি?'

'এখনও তা আমি ভাবছি না, তবে তুমি প্রলোভনে পড়তে পারো, দিনকাল ভাল না।'

'শোনো বিজয়! আমি বিশ্বাস করি তুমি নারীর হৃদয় বোঝো, মৌতলার সে নারী আমিই, ' বিষাদ ঘনিয়ে উঠল যুবতির কণ্ঠে, কান্নায় সে মুখ ঢাকল।

বিজয়ের হৃদয় প্রকম্পিত হল। সামনের একগুচ্ছ স্বচ্ছ পাতা থেকে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে যুবতীর মুখমন্ডলে। তারই আভায় বিরঙ্গনার চেয়ে তাকে এক অসহায় নারী বলেই বেশি মনে হল বিজয়ের। তার সমস্ত হৃদয় হাহাকার করে উঠল। তবু নিজেকে সংবরণ করে বলল, 'সে তো ভাল, ভারত বিখ্যাত মানসিংহ হবে তোমার শ্বশুর, তুমি তো ভাগ্যবতী!'

যুবতী ভ্রুকুটির সাথে তিক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল বিজয়ের ওপর, ‘তুমি এ কথা বলতে পারলে বিজয়! নাপিতের মেয়ে পরিচয় ঘোচাব বলে অস্ত্র শিক্ষা নিয়েছি, বিশ্বাস করেছি-কর্মের পরিচয় আমার জন্মের পরিচয় ঢেকে দেবে, দেশকে পরাধীন হতে দেব না বলে যুদ্ধবিদ্যা শিখেছি, আজীবন মোঘালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, এ স্বাধীন দেশে আমার স্বাধিকার কই? রাজনীতির খেলার পুতুল হলাম আজ, তোমাদের রাজার কাছে আমি শুধুই বিকিকিনির পাত্র, বুঝেছি রাজনীতিতে নীতি বলতে কিছুই নেই। কিন্তু আমি ? আমার অর্জন? সবই রাজনীতির খাদে বিসর্জন দিতে দেব না বিজয়। তাই এসেছি তোমার কাছে।’

যুবতী আরও কাছে এগিয়ে এল বিজয়ের। কোমরের বসনের ভাঁজ থেকে দুই হাতে বের করল দুটি বস্তু। বামহাতে তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি, আর ডানহাতে সিঁদুরের কৌটা। পত্রগুচ্ছের পাশ দিয়ে আসা একফালি চাঁদের আলোয় বস্তু দুটি স্পষ্ট হল বিজয়রামের চোখে। একটি নব জীবনের, আরেকটি মৃত্যুর। বিজয় চক্ষুদুটি বিস্ফারিত করে সেদিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকল।

‘মনে করে দেখো যমুনা তীরের সেই যুদ্ধের কথা, ’ যুবতী আকুল হয়ে বলে চলল, ‘মহৎপুরের যুদ্ধে তুমি যখন মানসিংহের ফাঁদে পড়ে দূর্গে ঘুমুচ্ছিলে, গড়ের চোরা গহবর থেকে হামলা চালিয়ে আমি মানসিংহের সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করেছিলাম। তারা তোমার দূর্গ আক্রমণ জোরদার করতে পারেনি। সেই চাঁদনি রাতে সব শত্রু ফিরে গেলে আহত শরীরে তুমি দূর্গের বাইরে এসে আমার কোলে লুটিয়ে পড়েছিলে। সারারাত যমুনা বিধৌত সেই ঘাসের উপর বসে

আমি তোমার সেবা করেছিলাম। সমস্ত নক্ষত্ররাজি সে দৃশ্য দেখেছিল। তুমি বলেছিলে, প্রতিদান দেবে। আমি কিছুই চাইনি, কিন্তু আজ আমি বড় অসহায় হয়ে তার প্রতিদান চাই। যদি না দাও, এই ছুরি নিজের গলায় ঢুকিয়ে অকৃতজ্ঞ এই দেশ থেকে নিজেকে তুলে নেব,' বলল যুবতী।

যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য প্রবল প্রতাপশালী। রাজনীতির নিরবিচ্ছিন্ন চালিকা শক্তির অন্তরায় তিনি কোনো কিছুই সহ্য করেন না। উড়িষ্যা থেকে বিজয়রামকে তিনি নিজে এনেছেন। বিজয়রামের প্রতাপকে সম্মান দিয়ে তাঁর সেনাবাহিনীর একাংশের প্রধান করেছেন। মানসিংহের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি তাঁর রাজনীতির অংশ। দেশ ও রাজত্ব সামলানোর জন্য তিনি বহুবার এমনটি করেছেন। রেবতির সঙ্গে মানসিংহের ছেলের বিয়ে যদি তিনিই ঠিক করে থাকেন, তাহলে এ মুহূর্তে রেবতির সিঁথিতে সিঁদুর পরানো বিজয়রামের জন্য নির্ঘাত প্রাণদাণের মতো হবে।

বিজয়রাম কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল। সামনে এমন এক নারী দাঁড়িয়ে যার স্বাধিকারকে সমুন্নত রাখার সাহস তার নেই। অথচ পুরো দেশের স্বাধিকারের জন্য সে জীবন দিতে প্রস্তুত।

দূরে একটা অশত্থগাছ। তার ঝুরিগুলো জোছনার আলো-আঁধারীতে স্থির হয়ে আছে, যেন একটা মায়াবী ছবি। হঠাৎ একটি ঝুরি দুলে উঠল। দোলনার মতো দুলছে সেটা। বিজয়রামের শঙ্কিত মন সেই দোলায় চঞ্চল হয়ে উঠল।

‘চলো রেবতি! কেউ সম্ভবত আমাদেরকে দেখে ফেলেছে।’

‘থাকতে তো আসিনি, যেতেই তো এসেছি। আমি কী নিয়ে যাব? আমার মৃত্যু না তোমার সিঁদুর? বলে দাও বিজয়!’

বিজয়রাম আবার নিশ্চুপ। মস্তক অবনত করে সে কিছুক্ষণ নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকল। তার পর বলল, ‘তোমার অনিচ্ছার কথা রাজাকে বলোনি?’

‘উপযুক্ত মাধ্যম পাইনি, তবে এখন পেয়েছি, তার কথা রাজা না শুনে পারবেন না। তাই তোমাকেও তার কাছে নিয়ে যেতে এসেছি।’

‘কে সে?’

‘যশোরেশ্বরীর পূজারী।’

‘তিনি রাজার ইচ্ছার কথা জেনে থাকলে, নিবৃত্ত করার কথা ভাববেন না।’

‘সে দায়িত্ব আমার, ’ যুবতী চঞ্চলা হরিণীর ক্ষিপ্রতায় বিজয়ের দুটি হাত স্পর্শ করল। যুবকের শরীর-মনের অন্ধকারে গোপনে লালিত বাসনা জগতের সকল আলোকে বুড়ো আঙুল দেখাতে ব্যাকুল হয়ে উঠল। মহৎপুরের যুদ্ধ থেকে রেবতি বিজয়রামের চোখে সেই ফুল, যে ফুল কোটি কন্টকের মধ্যে নিজ সৌন্দর্য ও সুবাসগুণে একলা বসে থাকে, সমস্ত জগত যাকে স্পর্শ করার আশায় ঘুরপাক খায়, পরশ করতে পারেনা। এখন বিজয়ের চোখের ওপর তার দুটি

চোখ, অদ্ভুত যাদুমাখা কণ্ঠে সে বলল, ‘ভয় পেয়ো না বীর, পরাজয় কাকে বলে চিনতে শেখো! চলো!’ রেবতির আহবান যেন বিজয়ের ভেতর থেকেই এল। কোনক্রমেই তাকে অগ্রাহ্য করতে পারল না। নিজের ঘোড়া রেখে রেবতির ঘোড়াতে চেপেই দুজনে সেই জোছনাগাঁথা বনপথে ঈশ্বরীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হল।



রাজপুরীর সন্নিকটে পাথরে তৈরী উঁচু অতিথিশালা। নীচ দিয়ে যমুনার একটা উপধারা কুলকুল করে বয়ে চলেছে। ঈশ্বরীপুরের এই অতিথিশালা হাবসিখানা নামেও পরিচিত। জোছনালোক যমুনার জলে পতিত হয়েছে, সেখান থেকে একটা কাঁপা-কাঁপা প্রতিফলন উঠে পড়েছে অতিথিশালার দেওয়ালে। চারপাশে সুসজ্জিত বাগান। বাগানের আঁধার আর জোছনালোক মুড়ে রেখেছে অতিথিশালাটিকে। উড়িষ্যা থেকে একজন বীর এখানে আজ রাজার অতিথি হয়ে আছেন। ত্রিশ ফুট সোজা নীচের কুয়ো থেকে স্বচ্ছ শীতল জল পাথরের বালতিতে ভরে ওপরে তোলার ব্যবস্থা আছে পাশের ঘরে। অতিথি প্রাণ ভরে সেই শীতল জলে স্নান সেরে নিজের ঘরে সুন্দরীকাঠের খাটে এসে বসেছেন। মসলিন কাপড়ের ওয়াড় দেওয়া চিকন নারকেল ছোবড়ার তোষক পাতা খাটে, ওপরে সুতির টেরাকাটা ছাপের বেড কভার। এত ওপরে জল তোলার এই ব্যবস্থা দেখে অতিথি মনে মনে যশোহররাজকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। পাথরের মেঝে। সুন্দরীগাছের সরু সরু ডাল সাইজ করে কেটে হেতালের ছিটায় বেঁধে চেয়ার তৈরী করা। স্থানীয় প্রণালী ও উপকরণে তৈরী এই চেয়ার দেখে অতিথি বড়ই আপ্লুত। তারই দুটো চেয়ার রয়েছে মেঝেতে। একটার ওপর খাপবদ্ধ একটা তলোয়ার, অন্যটাতে যশোহররাজের প্রধান সেনাপতি খাঁজা কামাল বসে আছেন। সামনে সুন্দরীকাঠেরই তৈরী একটা টুলে হেরিকেন জ্বলছে। কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত নানান বিচিত্র বুনো পাখির কলরব ছিল। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে সেই কলরব

থেমেছে। এখন নিশিপোকার উদাত্ত চেঁচামেচি। তার মধ্যে কান পাতলে নীচ থেকে যমুনার কুলকুল ধ্বণি শোনা যায়।

একজন দাসী ঝিনুকের গ্লাসে দু গ্লাস আতাফলের রস নিয়ে সেখানে ঢুকল। চিকন লম্বা, পুষ্ট গড়ন। গায়ে কলার খোলার মতো আঁটোসাঁটো করে হলুদ রঙের শাড়ি পেঁচানো। একরাশ সর্ষে ফুলের মতো তেজ বের হচ্ছে গা দিয়ে। পায়ে সামুদ্রিক শামুখের নূপুর। সারা ঘরে তারই ঝংকার। অতিথি সামনে বাড়ানো পাথরের ট্রে থেকে একটা গ্লাস তোলার সময় লক্ষ্য করলেন, দাসী একটা সলজ্জ হাসি ছড়িয়ে রেখেছে তার দিকে। চুমুক না দিয়েই তিনি বললেন, ‘এই চেয়ার দেখে আমি মুগ্ধ, দুটো সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই।’

দাসী খাঁজা কামালের সামনে গিয়ে ট্রে বাড়িয়ে ধরল। তিনি গ্লাসটা তুলে একটা চুমুক দিয়ে কিছুক্ষণ চিবিয়ে চিবিয়ে স্বাদ উপভোগ করলেন, তার পর স্মিত হেসে বললেন, ‘গত মাসে দিল্লীতে দুটো পাঠানো হয়েছে, বেগম নাকি চেয়ার দুটো দরবারে ব্যবহার করতে দেননি, নিজের ঘরে রেখেছেন।’

কথাবার্তার মধ্যেই দাসী ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকল। খাঁজা বলতে লাগলেন, ‘এখানকার ছুতোর মিস্ত্রিরা খুব পটু, আমি সব ব্যবস্থা করে রেখে দেবো।...ভালো কথা-আপনি যে পাঠান বীর সে পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে, আর কতলু খাঁ যে আপনার পিতা তা ঘুণাক্ষরেও কারো সাথে বলবেন না!’

‘কেন? খোদ এই রাজমহলেও মোঘল গুপ্তচর আছে নাকি?’

খাঁজা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় বাইরে শাঁখা-কড়ির আওয়াজ হতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে দরজার কাছে এসে দেখলেন, পাথরের সিঁড়ি বেয়ে দাসী দ্রুত পায়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। যেতে যেতে সে একবার থমকে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকাতেই খাঁজার দৃষ্টির সাথে তার দৃষ্টি সংঘর্ষ ঘটল। তক্ষুনি একটা অনধিকার উপস্থিতির জন্য অপরাধবোধে মস্তক অবনত করে সিঁড়িতেই কাঠ হয়ে থাকল। যেন একটা হলুদ পাখি গোধুলির অন্ধকারে পথ ভুলে ভিন্ন ডালে বসার দরুন সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। খাঁজা বুঝতে পারলেন, কিছু বলার জন্য সে এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে ছিল। 'কিছু বলবি ছলা?' কণ্ঠ তরল করে জিজ্ঞেস করলেন খাঁজা।

ছলা সেভাবেই মুখ নীচু করে বলল, 'যদি অভয় দেন, জরুরী খবর আছে।'

খাঁজা অতিথির নিকট থেকে সময় নিয়ে নীচে নেমে এলেন। অতিথিশালার উঠোনে কয়েকটা কেওড়াগাছের অন্ধকারে এসে আগেই দাঁড়িয়েছে ছলা। খাঁজা সেখানে আসতেই ছলা নীচু স্বরে বলল, 'সর্বনাশ হয়েছে! মানসিংহের ছেলের সঙ্গে যার বিয়ের তোড়জোড় করছেন, সে আজ অন্যকে বিয়ে করছে!'

খাঁজা কামাল ভেতরে কেঁপে উঠলেন, বাইরে বুঝতে দিলেন না, 'তুই ভুল শুনেছিস।'

'না জনাব, পারুল বনের আড়াল থেকে গুপ্তচর সব দেখে ফেলেছে, আরেকটু পরেই যশোরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে ওদের বিয়ে!'

যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য আজ বাইরে আছেন। জেসুইড পাদ্রিদের একটি গির্জার অভিষেক অনুষ্ঠানে উদয়াদিত্যকেও নিয়ে গেছেন তিনি। আজ ফিরবেন না। সেখানে ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের দমনের ব্যাপারে মল্লদেবের সাথে আলোচনায়ও বসবেন। রাজার অনুপস্থিতি একটা সুযোগ, রেবতি সেটিই কাজে লাগাতে পারে। খাঁজা জানতে চাইলেন, 'ছেলেটি কে জানিস?'

'সে খবরও জানি জনাব, বিজয়রাম।'

বিজয়রামের কথা শুনেই চমকে উঠলেন খাঁজা। রাজার রোষে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে বিজয়! কে ঠেকাবে তাকে? আহা! ওর কচি শিশুর মতো মুখখানা খুব মনে পড়ছে। মনে পড়ছে বেদকাশির সেই ঘোলাটে জলযুদ্ধের কথা। সমাসন্ন সন্ধ্যায় বেদকাশীর অশান্ত জলে মগ দস্যুদের আক্রমনে যখন খাঁজার নৌকা প্রায় উল্টে যায়, দুই বাহুর অসীম শক্তিতে নৌকার উল্টো পাক রুখে দিয়েছিল বিজয়, তা নাহলে নৌকার তলায় সেদিনই শলীল সমাধি ঘটত খাঁজার। মগ দস্যু জুং ফু এই অসীম বিরত্ব দেখে পিছু হটে গিয়েছিল। সেই থেকে বিজয় তার নিজের পুত্রের মতো। রাজনীতির অন্ধকারে ছেলেটার হাড়-কঙ্কাল চিরতরে লুকিয়ে যাবে, খাঁজা মানতেই পারছেন না। দাসীকে বিদায় দিয়ে সেখানেই চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তার পর অতিথির কাছে না ফিরে প্রাসাদপাশের সরু বনপথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন অন্ধকারে। তার অভিমুখ যশোরেশ্বরী মন্দিরের দিকে। মন্দির এখান থেকে বেশি দূরে নয়। কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা আরতির দীপ্ত আওয়াজ আসছিল, সেটা এখন নেই। জঙ্গলাকীর্ণ দিঘীর পাশ দিয়ে যাওয়ার

সময় ক্ষীণ জান্তব গোঙানির মতো শব্দ কানে এল, খাঁজা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দীঘির শান্ত জলের চারপাশে গাছপালার ছায়া, মাঝখানটাতে চাঁদের আলো। খাঁজার বিশ্বাস, আওয়াজটা দিঘী থেকে আসছে। চারদিকে চোখ মেলে তিনি অনুসন্ধান করছেন, ঠিক সেই সময় লক্ষ্য করলেন তার পিছন দিকে দিঘীর কোণায় পাতা-লতার ঝোপটি একবার অন্ধকারে ঢুকছে, আরেকবার জোছনায় বেরিয়ে আসছে। এর অর্থ-ঝোপটি নড়ছে। তিনি পিছিয়ে সেখানে ফিরে যেতেই নড়াচড়াটি বন্ধ হয়ে গেল, তখনই ওদিকের পাড়ের ঝোপ-জঙ্গল হতে শিয়ালের মতো একটা জন্তু ধীরে হেঁটে পিছনের ঝোপে ঢুকে গেল। খাঁজা বুঝতে পারলেন, কোনো শিয়ালিনী এখানে প্রসব যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে, পাড়ের ওই শিয়ালটি তারই পুরুষ সঙ্গী। নিশ্চিন্ত হয়ে খাঁজা আবার মন্দির অভিমুখে হাঁটতে উদ্যত হলেন, হঠাৎ তার পাশ ঘেঁষে ভিষণ জোরে একটা ধাতব ওপর থেকে মাটিতে এসে পড়ল। মাটিতে গেঁধে জোছনার ফালি চমকিয়ে সেটা একটু দুলে স্থির হয়ে গেল। লকলকে বর্শা। পাশের কেওড়াগাছের ওপর থেকে পড়েছে। বিপদ আঁচ করতে পেরে খাজা জলদি পাশের একটা গাছের আড়ালে চলে গেলেন। কোমরের খাপ থেকে আসন্ন শত্রæর মোকাবেলার জন্য তলোয়ার উন্মুক্ত করলেন। সেই ফাঁকে ঝরঝর করে গাছ থেকে কেউ নেমে ছুটে পালিয়ে গেল। বর্শা পরখ করে খাজা বুঝলেন মগ জলদস্যুদের গুপ্তচর এসেছিল। মগ দস্যুরা সাধারণত এরকম বর্শা ব্যবহার করে। আজ গুমানতলীর দক্ষিণে কোনো প্রহরা নেই। ভাঁটি চলছে। বনের শীরানদীগুলোয় জল কম। কম জলের নদীপথে মগদের

পক্ষে আক্রমণ করা সম্ভব নয়, তাই ওখানকার সৈন্যদের বেদকাশির দূর্গে পাঠানো হয়েছিল।

খাঁজা কামাল চিন্তামগ্ন হলেন। মগ দস্যুরা আক্রমণ করতে পারে, এ ঘটনা তারই ঈঙ্গিতবাহী। গুমানতলীতে সৈন্য প্রেরণ করতে হবে। এ মুহূর্তে বিজয়রামকেই প্রয়োজন, তিনি তাকে ডাকতে পাঠাবেন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরতে চাইলেন সৈন্যশালায়। কিন্তু ফিরতে গিয়েই তার হৃদয়শীরায় বিজয়ের জন্য বিন্দু বিন্দু স্নেহ-ভালোবাসার ফোঁটা জমতে শুরু করল, তিনি ফিরতে পারলেন না। ইতস্তত পায়চারী করে আবার চলতে লাগলেন যশোরেশ্বরীর দিকে।





গাছপালার কোলে যশোরেশ্বরী মন্দিরের প্রাঙ্গন। গাছপালার খাঁজে খাঁজে অন্ধকার আর জোছনা জমে রয়েছে। মন্দিরের দরজাটা একটু খোলা, সেখান দিয়ে ভেতরের একটা ক্ষীণ লালচে আলো বাইরের চাতাল অবধি এসে মিলিয়ে গেছে। চাতালের পাশে একটা অশত্থগাছ অন্ধকারের পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকজন নেই। রেবতি আর বিজয়রাম অশত্থগাছের নীচে ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়ে পূজারীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সন্ধ্যা পূজা হয়ে গেছে।

নিবেদিত ফুল-ফলের গন্ধ আসছে। একজন পূজারী মন্দিরের ক্ষীণ আলোলাগা দরজা দিয়ে এইমাত্র বের হলেন। পিছনে মাটির প্রদীপ হাতে আসছে একজন নারী। একেবারে পিছনে একজন বৃদ্ধ। নারীটির মুখমণ্ডল ঘোমটায় ঢাকা। শুধু হাতে ধরা প্রদীপের আলোয় ঘোমটার তলা দিয়ে আরক্তিম মুখমণ্ডলের নীচের অংশ দেখা যায়, বলাবাহুল্য, এ পূজারীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। পূজারীর মাথায় বাকলের পাগড়ি। রেবতি আর বিজয়ের সামনে যখন পৌঁছলেন, মুখ দেখা গেল না। পাগড়ির চতুর্পাশ দিয়ে পত্রগুচ্ছের ঝুমকো একেবারে বুক পর্যন্ত ঝুলছে, তাতে পূজারীর মুখমণ্ডল ঢেকে আছে। দীর্ঘকায়, মেদহীন শরীর। ইস্পাতসম কঠিন, তেজী ও দীপ্ত ভঙ্গিতে তিনি দাঁড়ালেন, কিন্তু তার উপস্থিতিতে উপচে পড়ছে ফুলের মতো এক কোমল কান্তি। দুজনে তাকে প্রণাম করতে উদ্যত হলে ঘোমটাপরা নারী প্রতিহত করল, রেবতি ও বিজয় নিজেদেরকে সামলে হাঁটুমুড়ে প্রণামের ভঙ্গিতে বসে পড়ল মাটিতে। পূজারী স্থির ভঙ্গিতে ডান হাত ঊর্দ্ধে তুলে আবার নামালেন। তা দেখে ঘোমটাপরা নারীটি মন্দিরের দিকে কারো উদ্দেশ্যে ঘাড় ঘোরালো, প্রদীপের ছড়িয়ে পড়া ক্ষীণ আলোয় তখনই অন্য একজনকে আসতে দেখা গেল। ইনি আরেকজন পূজারী, বাকলের পোষাক পরিহিত, শরীরের ঊর্দ্ধাংশ আলগা। সারা মুখমণ্ডল দাঁড়ি-গোফে ঢাকা। লম্বা জটপাকানো চুল। কপালে রক্তিম তিলক।

রেবতি অত্যন্ত বিগলিত হয়ে নিজের আর্জি পেশ করল, 'ঠাকুর, আমার নারীত্ব ও ব্যক্তিত্ব দুই বিপন্ন, আমি তাই এসেছি আপনার

কাছে, আমার বিশ্বাস আমাদের মহামতি রাজা আপনার কথা শুনবেন।'

'কী আর্জি বলো মা!' শেষে আসা পূজারী জিজ্ঞেস করলেন।

'সারা জীবনধরে যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, রাজা তার সাথে আমার বিয়ে ঠিক করেছেন, আমি রাজ সিদ্ধান্ত অস্বীকার করছি না, কিন্তু আমার অন্তকরণের শক্তি ও বিশ্বাসকেও অস্বীকার করি কেমনে? আমি এই যুবককে ভালোবাসি, আমাদের রাজাকে একটু বোঝান ঠাকুর, নইলে এ জীবন আমি রাখব না।'

'ঠিক আছে তাই হবে, একটি দেশ তখনই পুরো স্বাধীন, যখন তার নাগরিকরা এমন স্বাধীনতা ভোগ করে যা তাদের জীবনের জন্য মঙ্গল ও মূল্যবান, আমার বিশ্বাস-আমাদের প্রজাবৎসল রাজা তা মানেন, কিন্তু এই যুবকের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, এ কি এই বিয়েতে রাজি?'

বিজয়রাম কখনও নিজের শাসনে শাসিত হয়নি। অন্যের শাসনকে সে মেনে চলেছে। নিজের ভেতরে তার ইচ্ছে আছে, তবে তা কম জোরাল, অথবা যতটুকু ইচ্ছেশক্তি একজনকে অথর্ব অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারেনা, ততটুকু আছে। কিছু কিছু মানুষের এমন থাকে। যেমন রেবতির চাপে সে আজ চলে এসেছে, ভেতরে তার যাই থাকুক না কেন, বাইরে রেবতির শাসনে সে চলে এসেছে। কাজেই নিজের থেকে সে কী বলবে? সে শুধু বলল, 'যদি রাজাকে বোঝানো যায়, তবে আমার আপত্তি নেই।'

দ্বিতীয় পূজারী বললেন, ‘দেখো যুবক আমি জানতে চাচ্ছি তুমি রেবতিকে ভালোবাস কিনা?’

বিজয়রাম একটু সময় নিয়ে উত্তর দিল, ‘হ্যাঁ, তবে ভয় পাই, যদি রাজা মেরে ফেলেন!’

‘তোমার যে সময়টা বরাদ্দ, সে পর্যন্ত কিছু ঘটবে না। ভয় নেই।’

প্রথম পূজারী ডান হাতটা আবার ঊর্দ্ধে তুললেন। ঘোমটাপরা নারীটি একটা কাঁসার থালায় প্রদীপটি নিয়ে তাদের সামনে বাড়িয়ে ধরল। থালাতে আমের পাতায় সিঁদুর রয়েছে। সে মাথা দুলিয়ে বিজয়রামকে রেবতির সিঁথিতে সিঁদুর দিতে ঈঙ্গিত করল। প্রদীপের আলো রেবতির মুখে এমন একটা আলো দেখালো, যাকে ঠিক রূপের বলা যাবে না; রূপ আর জীবনের মিশেল। মৃত্যুও এ আলো কেড়ে নিতে পারে না। রেবতি মাথাটা বিজয়ের দিকে বাড়িয়ে ধরে হাসিমুখে যাচল, ‘কই দাও!’ ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত প্রকৃতি যেন একই অনুরোধ করল, ‘কই দাও!’ বিজয়ের ভেতরে চারটি দেওয়াল ছিল, তার মধ্যে নানান কথা-বার্তা বাজত, বিজয় তা ঠিক শুনতে পেত না। আজ এই আকুতি তার সেই চার দেওয়ালের মধ্যেও বাজল, এবং সে পরিষ্কার শুনতে পেল। নিজ ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো নিজস্ব বস্তু আর কী আছে? বিজয়রাম কুণ্ঠার খোলস থেকে বেরিয়ে প্রকৃত বীর হতে চাইল। তার মনে হল-পৃথিবী তাকে ডাকছে কাঁধ শক্ত করতে, তার পৌরুষ অপরিসীম, দমিয়ে রেখে তার অপমান করা মানেই মৃত্যুর সামিল। সে স্থির অকুণ্ঠচিত্তে রেবতির সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিল।

দ্বিতীয় পূজারী বললেন, 'এই তোমাদের বিয়ে হল, কিন্তু এই মুহুর্তে এখান থেকে তোমাদের গা ঢাকা দিতে হবে। কোথায় থাকতে হবে সেটাও বলে দিচ্ছি, গুমানতলীর বিল পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অবিনাশ নামে আমার এক শিষ্য থাকে। একটা মাটির মন্দির আছে সেখানে। পাশে খুব বড় একটা দিঘী। সেখানে ক'টা দিন কাটিয়ে আসবে। তাকে আমার হাতের এই সূতোটা দিলে সে বুঝতে পারবে,' বলেই পূজারী নিজের হাত থেকে লাল একটা সূতো খুলে রেবতির হাতে দিলেন, 'যাও! এক্ষুণি চলে যাও!'

দুজনেই হাঁটুমুড়ে বসে প্রণাম সারার পর রেবতি কোমরের তলোয়ার ঠিক করে এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে লাগাম হাতে নিল, তারপর উঠল বিজয়। জঙ্গলের সরুপথ কেটে ঘোড়া ছুটতে লাগল, চাঁদটাও ছুটছে, উত্তাল গতি ছন্দে বৃক্ষ-মাঠের দিগন্তও লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। নববন্ধনে আবদ্ধ এই জুটি নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার আনন্দ পাওয়ার নেশায় ছুটে চলতে লাগল অপরিচিত ভুবনের দিকে। সে ভুবন তাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।

রেবতি আর বিজয় চলে যাওয়ার পর সেখানে এসে হাজির হলেন খাজা কামাল। সব শুনে তিনি দ্বিতীয় পূজারীকে বললেন, 'কিন্তু বিজয়কে আমার খুব দরকার, আমি কী করব?'

পূজারী উত্তর দিলেন, 'আপনি সেনা নায়ক, এক যোদ্ধা হারিয়ে গেলে আপনি ভেঙে পড়তে পারেন না। আপনি প্রস্তুতি নিন।'

খাজা অনেক কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। বিজয়ের আপাতত প্রাণ রক্ষা হয়েছে, যশোহররাজ এ মুহুর্তে

বিজয়ের নাগাল পাবেন না, খাজা তাতেই অনেকটা স্বস্তি পেলেন। তিনি ফিরে গেলেন নিজের সৈন্য শালায়। মগ দস্যুদের প্রতিহত করার জন্য তার হাতে সময় কম।



রাত দুপুর। গুমানতলীর প্রকাণ্ড বিল পার হচ্ছে রেবতি আর বিজয়ের ঘোড়া। জোছনায় দূর দিগন্ত ধূসর দেখাচ্ছে। গতকাল বৃষ্টি হয়েছিল, জায়গায় জায়গায় জলের দাগ জোছনায় চকচক করছে। নিরেট নিস্তব্ধ বিলের মধ্যে ঘোড়ার শব্দ বড্ড বেমানান। এখানকার পৃথিবী ঘুমন্ত, চঞ্চলতা এখানে মানায় না।

এক জায়গায় গাছপালার একটা ঝোপ, ঝোপের অন্ধকারটা জোছনায় বেশ কালো দেখাচ্ছে। শ্মশান বলে মনে হয়। তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ঘটল বিপত্তি। শ্মশানের দিক থেকে উড়ে এল বিরাট একটা জাল, ঘোড়াসুদ্ধ তাতে আটকে পড়ল দুই নিঃসঙ্গ যাত্রি। তারা কম্পিত হলেও শঙ্কিত নয়। এমন টোপ ও ফাঁদ তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গী। এই নিয়েই তাদের এগোতে হয়। তাদের জীবনের আসল সুখটি এরকম আচমকা বিপদ-কোষের নিউক্লিয়াসে আবদ্ধ, ওপরের ছাল ছাড়িয়ে তাকে ছুঁতে হয়। ঘোড়া দিগ্বিদিক ছটফট করে ছাড়িয়ে গেল, কিন্তু রেবতি আর বিজয় জড়িয়ে থাকল জালে। শ্মশানের অন্ধকার থেকে রিরি করে ছুটে এল কয়েকজন আক্রমণকারী। বেশি নয়, পাঁচ-ছয়জন। গায়ে ছাল-পাতা, হাতে বল্লম, মাথায় পশুর চামড়ার পাগড়ি। এরা মগ জলদস্যু। গুমানতলীর বিল প্রায় শেষ হতে চলেছে। ওপাশেই স্পষ্ট দেখা যায় নিবিড় নিশ্চিন্ত সুন্দরবন। জোছনার রূপোলি মুকুট মাথায় দিয়ে অলৌকিক রাজার বেশে দাঁড়িয়ে আছে। তার বক্ষশিরায় কিলবিল করে প্রবাহিত হচ্ছে অসংখ্য নদ-নদী। আজ ফাঁকা পেয়ে মগ দস্যুরা সেই শান্ত চন্দ্রভুক নদীর জলে দস্যুবৃত্তি

করতে এসেছে। তাদের একটি পাহারাদল ওই শ্মশানে লুকিয়েছিল।

মগ জলদস্যুরা বিজয় আর রেবতিকে বেঁধে ফেলল। বিজয়ের গায়ে সেনার পোষাক, তারা প্রতাপাদিত্যের একজন সেনাকে আটক করতে পেরেছে জেনে উদ্দাম উল্লাসে হই হই করতে লাগল। বিজয় যুদ্ধের প্রস্তুতিতে বেরিয়েছিল। সে কারণে তলোয়ার ও ছোট চাকু তার ছিল। চাকুটি গাঁটির নীচে গোপন স্থানে রয়েছে। কিন্তু তলোয়ার? মগেরা তার খাপ থেকে তলোয়ার কেড়ে নিতে গিয়ে দেখে তলোয়ার নেই। তারা এর কারণ জিজ্ঞেস করল। বিজয় দুর্দান্ত অভিনয় করল এ সময়। চোখে-মুখে আকুতি ফোটাল, বলল, 'আমরা চুরি করে বিয়ে করে পালাচ্ছি, তলোয়ার আর কী দরকার? তাই ফেলে দিয়েছি।' মগদের হইহই উল্লাসের সময় বিজয়রাম একটি কাজ করে ফেলেছিল। জোছনার বিমুগ্ধতা কিছুটা বোধহয় দৃষ্টি সংকটের দরুন। যাইহোক, জোছনায় যে দৃষ্টি সংকট ঘটে সে তো সবার জানা। সেই দৃষ্টি সংকট কাজে লাগিয়ে বিজয়রাম তার তলোয়ারটি ছুঁড়ে দিয়েছিল এক চরম নিশানায়। দেশ রক্ষার সে একজন দক্ষ সেনা। আজ শুধু দেশ নয়, তার নবপরিণীতা বধুকেও রক্ষার দায়িত্ব এসেছে। তার সৈনিক জীবন গর্বিত করতে এতবড় সম্ভাবনা এর আগে কখনও আসেনি। কিন্তু এই চরম মানসিক চাপে ঠিকঠাক কাজ করতে পারার আত্মবিশ্বাস সে পেল কী করে? তার মতো তলোয়ারবাজ সেনার জন্যেই কি সম্ভব? সে জানে। মনে মনে 'জয় মা কালী' বলে সবার অলক্ষ্যে সে তলোয়ারটি ছুঁড়েছিল, যেখানে ফেলতে চেয়েছিল, এক চুল এধার

ওধার হয়নি, ঠিক সেখানেই পড়েছে। ওই যে, বিল শেষে বয়ে চলেছে নদী, বিশাল বড় একটা কেওড়াগাছের গোড়ায় নদীর জল ঘেঁষে একফালি জোছনা পেয়ে একটুখানি জায়গায় চকচক করছে চরকাদা, ওই কাদায় গেঁথে রয়েছে তলোয়ারটা, ওর পাশেই বাঁধা রয়েছে মগদের নৌকা। মা কালীর কৃপা পেয়ে বিজয়রাম মনে মনে 'জয় মা কালী' বলে উঠল তুমুল আত্মশক্তিতে।

মগ দস্যুরা বিজয় আর রেবতির হাত পিঠের দিকে মুড়িয়ে বাঁধল, তার পর কোমরে দড়ি পেঁচিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল নৌকোর দিকে। বিজয় এই ফাঁকে আরেকটি কাজ করল। হাত পিছনে, কব্জির কাছ থেকে বাঁধা, কিন্তু আঙুলগুলো খেলানো যাচ্ছে, গাঁটির ভেতর থেকে গোপনে ক্ষুদ্রাকৃতির ধারালো চাকু বের করে প্রশিক্ষিত আঙুলের কারিশমায় দড়ির বাঁধন কেটে ফেলল, কিন্তু দুই হাত ছাড়িয়ে ফেলল না, মগরা বুঝতে পারল না যে হাতের বাঁধন খোলা। দস্যুরা উল্লাস করছে, তাদের লিডার বনের মধ্যে রয়েছে, এই কাংখিত সৈন্যদের পেয়ে লিডার না জানি কত্ত খুশি হবে! নৌকার কাছে আসতেই মাঝি আগে ঝাঁপিয়ে উঠল, একটা গাছের শিঁকড়ের সাথে নৌকার দড়ি বাঁধা রয়েছে, সে সেই বাঁধন খোলার তালে ব্যস্ত। দুজন দস্যু বিজয় আর রেবতিকে ধাক্কা মেরে ঠেলে তুলে দিল নৌকায়। এই ধাক্কা আর নড়ন-চড়নের মধ্যে বিজয় মুখখানাতে বেশ একটু ঝাঁকি দিয়ে নদীর জলের দিকে তাকাল রেবতিকে দেখানোর জন্য। বনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ধোঁয়াটে জোছনার আঁচ এসে রয়েছে জলে, রেবতি সেখানে একটা তলোয়ারের ছায়া দেখতে পেল। তার বুঝতে অসুবিধা হল না, এটা

বিজয়েরই। শেষ দস্যুটি যখন নৌকায় উঠে গেছে, মাঝিও নৌকা ছেড়ে দিয়েছে, ঠিক তখনই বিদ্যুত বেগে লাফিয়ে উঠে তরবারিটা নিয়েই পাশের কেওড়াগাছের ঝুঁকে থাকা বড় একটি ডাল এক কোপে কেটে দিল, ততক্ষণে রেবতি বিজয়ের বাড়ানো হাত ধরে ফেলেছে। রেবতিকে এক টানে নৌকা থেকে তুলে দুজনেই সাঁই করে উঠে গেল সেই গাছে। বড় ডালটি নৌকার উপরে ঝুলে ছিল, ডালটাকে সময় মতো এবং যুতসই মাঝির ঘাড়ে ফেলতে পারলে নৌকা যে কাত হবেই, বিজয় সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিল। এই কৌশলটিই কাজে লাগানোর জন্য তার তলোয়ার ছোঁড়া। পরিকল্পনা মাফিক ঠিক ঠিক কাজ হয়েছে, ডালের পতনে মাঝি আগেই কাত হয়ে নদীতে পড়ে গিয়েছে, নৌকাও কাত হয়ে ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। এই দশায় বিজয় নৌকার ওপর ঝুলে থাকা আরও কয়েকটা ডাল ঝপাঝপ কেটে দিল। তার ধাক্কায় নৌকোয় যে হুটোপুটি সৃষ্টি হল, তাতে দস্যুরা সবাই গিয়ে পড়ল জলে। রেবতির হাতে কচার মতো গরান গাছের একটা ডাল, আর বিজয়ের হাতে তলোয়ার, এই দুই দিয়েই দস্যুদের জল থেকে উঠতে দিল না। দস্যুরা জলে ভাসা ডাল ধরে বাঁচার চেষ্টা করছে, তখনই তাদেরকে তলোয়ার আর লাঠিপেটা করে সাবাড় করে দিল। জল শান্ত হয়ে এলে নিজেদের পোশাক ত্যাগ করে মগদের পোশাক পরেই সেই নৌকাতে চড়ে ঢুকে পড়ল গভীর জঙ্গলে।

পরের ঘটনা খুব স্পষ্ট। খাঁজা কামাল সৈন্য নিয়ে গুমানতলীর দক্ষিণে পৌঁছে গিয়েছিলেন। বিজয় আর রেবতি মগদের তিনটে বড় নৌকাকে বেঁধে ফেলে যখন মগের পোশাক ছেড়ে নিজেদের

চেনাল, আর তাদের পিছনে খাজার বাহিনী এসে দাঁড়াল, তাই দেখে মগদের লিডার জলে ঝাঁপ দিয়ে আর উঠল না। কে তাকে মারল কে জানে? জলের হুড়োহুড়িতে কুমির এসে গিয়েছিল সম্ভবত। চাঁদ লাগা জলের ঢেউয়ে চাঁদের রঙ যখন রূপোলি থেকে লাল হয়ে গেল, বাকি জল দস্যুরা এমনিতেই পিঠটান দিল। শান্ত অনুগত অবনত মস্তকের বিজয়ের দিকে চেয়ে খাঁজা কামাল প্রসন্ন হলেন। মনে মনে বললেন, যে বিজয় তুমি উপহার দিয়েছ, তার জন্য রাজার কাছ থেকে আমি উপহার আনবই, যে উপহার তোমার জীবনের জন্য দরকারি।



জেসুইড পাদ্রিদের গির্জা উদ্বোধন করে রাজা প্রতাপাদিত্য কখন ফিরেছেন কেউ জানেনা। গত রাতে যুদ্ধ শেষে খাঁজা কামাল সসৈন্যে ফিরে এসেছিলেন। রেবতি ও বিজয় পূজারীর কথা মতো রয়ে গিয়েছিল বনে। সকালে রাজা খাঁজা কামালকে ডেকে পাঠালেন। খাঁজা বেশ আশ্চর্য হলেন। তিনি নিশ্চয়ই সকালে ফেরেননি। কিন্তু তাঁর আগমনের খবর সেনাপতি জানবেন না- এমনটা তো আগে ঘটেনি।

ধূমঘাটের রাজভবনে যে ঘরে যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য বসে আছেন, সেটা একটা পরামর্শশালা। সাধারণত এখানে তিনি খুব একটা বসেন না। দশটা নিরাপত্তা বলয় পেরিয়ে এই ঘর। কিন্তু আজ তার পূব দিকের দরজা খোলা, গল গল করে সকালের কাঁচা রোদ ঢুকছে ভেতরে। একটা বাগান দেখা যাচ্ছে, ওই বাগানের বিশেষত্ব, সম্প্রতি উত্তর ভারত থেকে চারটে ময়ুর আনা হয়েছে। প্রগাঢ় নীলের লেজ লম্বা একটা ময়ুর ওই বাগানের ঝাঁকড়া একটা লিচুগাছের ডালে বসে আপন মনে পেখম খোচাচ্ছে। আর একটা ময়ুরী খুব মনোযোগের সঙ্গে তা দেখছে ওই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে। প্রদাপাদিত্য খোলা দরজা দিয়ে ময়ুরদুটিকে দেখছেন, আর মনে মনে প্রীত হচ্ছেন। এ সময় অনুমতি নিয়ে সেখানে প্রবেশ করলেন খাঁজা কামাল।

‘আসুন সেনাপতি!’ বললেন প্রতাপাদিত্য, মুখে ময়ুর দর্শনের খুশি তেমনই উজ্জ্বল ‘মানসিংয়ের ছেলের বিবাহ অনুষ্ঠানের কতদূর কী করলেন?’

কী উত্তর দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না খাঁজা, চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন, তিনি ভেবেছিলেন, মগ জলদস্যুদের কথা শুনবেন রাজা, কিন্তু তার ধারে-কাছেও গেলেন না।

খাঁজা কামাল রাজার কথার উত্তর না দিয়ে অনুনয়ের সুরে বললেন, ‘মহারাজ গত রাতে এ রাজ্য এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ থেকে বেঁচে গেছে, মগ জলদস্যুরা বিপুল শক্তিতে লুটতরাজ চালাতে এসেছিল, কিন্তু বিজয়রাম অসীম সাহসে একাই তাদের কুপোকাত করেছে, আমাদের একটি সেনাও হত হয়নি। তার বিচিত্র যুদ্ধ কৌশল আমায় মুগ্ধ করেছে, সেনাপতি হিসেবে আমি বিজয়ের জন্য আপনার কাছে উপহার চাইতে এসেছি, যদি অভয় দেন তো বলি!’

যশোহররাজ শান্ত মুখে বললেন, ‘আজ আমার মন ভাল আছে, কী চান বলুন!’

‘আমি বিজয়ের জন্য রেবতিকে ভিক্ষা চাই! ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে।’

যশোহররাজ স্মিত হাসলেন, বললেন, ‘আপনি বুদ্ধিমান, কিন্তু আজ হেরে গেছেন, রেবতিকে ভিক্ষা দেওয়ার আমি কে? রেবতি তো নিজেই নিজেকে ভিক্ষা দিয়েছে, আমার কাজ তার ইচ্ছাকে

সমুন্নত রাখা, তাই করেছি, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রেবতি আর বিজয়ের বিয়ে দিয়েছি, গতরাতে যশোরেশ্বরীর মন্দিরে পূজারী সেজে আমিই ছিলাম, মুখ ঢাকা ছিল বলে আপনারা কেউ আমাকে চিনতে পারেননি। মল্লদেবের ওখান থেকে ফেরার পথে চরের মুখে শুনলাম, রেবতি মানসিংহের ছেলের সাথে বিয়েতে রাজি না। আমি তাকে জোর করে বিয়ে দিচ্ছি বলে অভিযোগ ব্যক্ত করেছে। আমিও তো সারা জীবন মোঘলের সাথে যুদ্ধ করেছি, হঠাৎই নিজের মধ্যে রেবতির হাহাকার শুনতে পেলাম, তাই সিদ্ধান্ত নিলাম-রেবতির ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাব না, ওর ইচ্ছেতেই ওর বিয়ে দেব, অন্যদিকে মগ জলদস্যুদের খবর জানি, এবং এও জানি-জলদস্যুদের কাত করতে বিজয়ের জুড়ি নেই, ওকে গুমানতলীতে পাঠাব, সঙ্গে আপনাকেও, আপনাকে অন্যভাবে বলতাম, কিন্তু দেখি-মগদের বিরুদ্ধে আপনি প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছেন, তাই আর বলিনি।’

খাঁজা কামাল চমকিত ও পুলকিত হলেন, ‘কিন্তু মহারাজ, মানসিংয়ের ছেলের বিয়ে?’

‘সে ব্যবস্থা করেছি, গতরাতে যশোরেশ্বরীর মন্দিরে ঘোমটাপরা একজন নারীকে দেখেছিলেন, ওর নাম সুশীলা, ব্রাহ্মণ, ভদ্র, সুশ্রী, জগতসিংয়ের সাথে ওর বিয়ে ঠিক করেছি, বৃদ্ধ একটি লোককেও মন্দিরে দেখেছিলেন, লোকটি সুশীলার বাবা, নকিপুরের বাসিন্দা।’ যশোহররাজ উঠে দাঁড়ালেন, রোদলাগা মার্বেল পাথরের মেঝেতে তাঁর সটান সহজ মূর্তি ঘরখানার কোণায় কোণায় বসে থাকা আবছায়াকে হাসিয়ে তুলল। ধীর পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে

গেলেন বাগানের দরজার দিকে, রোদেভাসা বাগানের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘এখন যান, দুটো অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন, জগতসিংয়ের বিয়ে আর রেবতির বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান একই দিনে হবে।’

***



সূত্র :

১। **প্রতাপাদিত্য চরিত** (১৮০১ সালে শ্রীরামপুর প্রেসে ছাপানো) - রামরাম বসু।

২। **“বাহারিস্তান-ই-গায়েবি”-(**মির্জা নাথান রচিত)- স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক প্যারিস মিউজিয়ামে আবিষ্কৃত।

৩। **যশোর খুলনার ইতিহাস**- সতীশ চন্দ্র মিত্র।

লেখক পরিচিতি

খোলা মাঠ, গভীর আকাশ, নির্জন বনপথ, নির্মল বাতাস- গ্রামের এই পরিবেশেই বাবলু ভঞ্জ চৌধুরীর জন্ম। বেড়ে ওঠাও ওই পরিবেশে। শৈশব সর্বদাই তাঁকে ছেয়ে থাকে। সেই ছাপ থেকে হাফ ছেড়ে বাঁচার পথ খোঁজা লেখালেখির মধ্যে। না, শুধু সে জন্যে নয়। রোদের বাহার,বাতাসের স্বর, বৃষ্টির সুর, আকাশের দূর-ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনে চীরকালীন মানুষের বিষ্ময়, মুগ্ধতা, বন্দনাবোধ এবং প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। তারই জন্যে; এবং সেই সাথে প্রকৃতিতে যে রুপ ও রঙের শিল্প আপনি ফুটে থাকে, সেই শিল্পসত্বার খানিকটা পেয়েই যেন লেখালেখির আত্ম-তাগিদ। তা খুব ছোটবেলা থেকেই। ক্লাস ফোরেই নববর্ষার দিনে প্রকৃতি বন্দনা, কবিতা দিয়ে। ক্লাস সিক্সেই রেডিও শুনে শুনে সৃষ্টিতত্ব নিয়ে লেখা; কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ব্রুনো নিয়ে লিখে লিখে অঙ্কের খাতা ভরানো; আর মাকে পড়ানো। ক্লাস এইটেই বোঝা না বোঝার রবীন্দ্রনাথ, আর তাঁর সুর তার মধ্যে নিজস্ব অধ্যাত্মবোধের ঝড় তুলেছিল। ক্লাস এইটেই প্রথম পূর্নাঙ্গ গল্প, অষ্টআশির প্রলয়ংকরী ঝড়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে, ‘ঝড়ের ছোবল’ প্রকাশিত হয়েছিল স্কুল ম্যাগাজিনে। তারপর বাইরে আসেনি কিছু, দীর্ঘ বিরতী। তবে লেখার খাতায় জমা হত মাঝে মাঝে। চল্লিশে এসে নবজাগরণ। বাংলাদেশের প্রায় সব নামি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির শুরু। এখনও চলছে তা অবাধে। প্রথম গ্রন্থের প্রকাশ ২০১৭ সালে, ‘ভ,তের শহরদেখা’ ; দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রকাশ ২০১৮-তে ‘তককো ও

ফককো’; “শালিকবুড়ো ও ফড়িং (২০২০)” এবং “জোনা ও নীল আলো (২০২৪)” বইদুটি তাঁকে লেখক খ্যাতি এনে দেয়। তাঁর ভাষা বিচিত্রগামী। ভাষার পাত্রে চিন্তাগুলোকে এমনভাবে নিজস্ব ঢঙে সাজিয়ে রাখেন যে, তাঁর মতো করেই পাঠকমাত্রই তা বুঝতে পারেন। এখানেই তাঁর লেখনির শক্তি; আর এই কারিশমাই তাঁর বড় অলঙ্কার। সাহিত্যের সকল শাখাতেই বিচরণ। বড়দের জন্যও লিখে চলেছেন সমান তালে। জলবায়ু পরিবর্তন ও কল্পবিজ্ঞান তাঁর প্রিয় বিষয়। খুলনার ‘মৃৎ’ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত কল্পবিজ্ঞানধর্মী তাঁর ‘ফালো’ গল্পটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। সত্যজিত রায় আর সেলিনা হোসেন তাঁর আদর্শ। লেখালেখির পাশাপাশি গল্পের অডিও সংস্করণ নিয়েও কাজ করে যাচ্ছেন। Suspense Station নামে ইউটিউবে একটি চ্যানেল আছে তাঁর। এখানে নিজের ও অন্যান্য লেখকদের লেখা-গল্প শোনাচ্ছেন নিয়মিত। এছাড়া নিজের তৈরী বেশকিছু ব্লগ সাইটে নিয়মিত নিজস্ব বিশ্বাস, দর্শন, আত্মচরিতমূলক রচনা লিখে চলেছেন তিনি।

সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণশ্রীপুর গ্রামে ৩০ এপ্রিল, ১৯৭৫ সালে জন্মেছিলেন তিনি। বাবা অসীম ভঞ্জ চৌধুরী; মা রীতা ভঞ্জ চৌধুরী। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর, বর্তমানে সরকারি একটি ব্যাংকে কর্মরত।